BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/06.2024-44279918/BIJMRD/Vol -2 / 4/A35/মৌটুসী সাহ

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 4| May 2024| e-ISSN: 2584-1890

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যে ইতিহাস চেতনা

মৌটুসী সাহা

Research Scholar, Department of Bengali

RKDF University,Ranchi

Abstract:

'বনলতা সেন' কাব্যে জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনায় কোনো ঘটনা তারিখ বা বিবরণ নেই, এমনকি প্রচলিত অর্থের ইতিহাস-চেতনাও নেই। নারীকে বা নারীকেন্দ্রিক প্রেমকে মাধ্যম করে প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের প্রবল ইতিহাস-চেতনা। মনন ঋদ্ধ আবেগ ও ভাবনা জীবনানন্দ দাশের কাব্যে যে ধরনের স্বকীয় উদ্ভাস এনে দিয়েছিল, সেই উদ্ভাস থেকেই এক সুস্থিত ইতিহাস চেতনা কবির কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত কাব্যের নাম কবিতা, সবিতা, সুরঞ্জনা, নগ্ন নির্জন হাত, মিতভাষণ, শ্যামলী ইত্যাদি কবিতায় অন্তহীন সময়ের পটভূমিতে বহমান মানব সমাজের অগ্রগতির বোধ, পরিপূর্ণতার সহজ অন্বেষা ও শুভ প্রয়াণের ব্যগ্রতায় পৃথিবীর রণ রক্ত কোলাহলের অন্তর্লীন তাড়নার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনের মধ্যেই জীবনানন্দ একধরনের বিবর্তমান ইতিহাস চেতনা সঞ্চারিত করে গেছেন।

Key Words: *জীবনানন্দ দাশ, বনলতা সেন, ইতিহাস চেতনা।*

Introduction:

জীবনানন্দ তাঁর 'শ্রেষ্ঠকবিতা'র (১৯৫৪) প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিলেন- "...এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার; সুররিয়ালিস্ট।"১পরবর্তী কালে জীবনানন্দ ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তিনি এই অভিধাগুলিকে 'কোনো কোনো কবিতার' অধ্যায় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ভেবেছিলেন, 'সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয়'। তাই তিনি বলেছেন, 'বিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি"।২

'বনলতা সেন'(১৯৫২)কাব্যে ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে 'ইতিহাস' কী সে সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতিহাস'-কে যদি বিশ্লেষণ করি – ইতি + হ + আস'— অর্থাৎ এই রকমটাই ছিল। তাহলে মূল অর্থ দাঁড়ায়

অতীতের আবিষ্কারই ইতিহাস। কিন্তু এই কাব্যের কবিতাগুলি একটু বিশেষভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় জীবনানন্দ শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নন। তিনি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগ রক্ষা করে শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়' দেখেছেন। তাই সময়-চেতনার ক্রমাগত সম্প্রসারণে, সভ্যতার উত্থান ও পতন পর্যবেক্ষণ করতে করতে শাশ্বত যাত্রী-মানুষের মধ্যে বর্তমানের বৃত্ত থেকে ভবিষ্যতের দিকেও এগিয়েছেন শাশ্বত মানব-যাত্রারই মাধ্যমে। তাই বলেছেন –

"আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর, অন্তিম প্রভাতে।" (সুচেতনা)

এই বোধ ছিল বলেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কাছে বিস্ময়ের এবং মানবজীবনের প্রতিটি স্পন্দনই তাঁর কাছে ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস সম্পর্কেআচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি স্মরণীয়-

"ইতিহাস-এর ক্ষেত্র এখন একটু বেশ ব্যাপক ভাবেই ধরা হয় – জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। আগে ইতিহাস বলিতে রাজা-রাজড়ার কথা, রাজাদের ও অন্য শাসকবর্গের কীর্তি ও কৃতিত্ব, রাজাদের সন-তারিখ এবং রাজাদের রাজত্বকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বড়ো বড়ো ঘটনার তারিখ ও বিবরণ – লোকে এইটুকু বুঝিত। এখন আমরা জানি, এ-সব ঠিক বা পুরা ইতিহাস নহে, এসব হইতেছে ইতিহাসের কঙ্কাল। রাজার রাজত্বকাল, সন তারিখ এসবকে আশ্রয় করিয়া তবে ইতিহাসের গতি বা ধারা বুঝা যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে জাতির প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সভ্যতার ইতিহাস।...... কোনও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"[৩]

ইতিহাস চেতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এলিয়ট বলেছিলেন "a perception not only of the pastness of the past, but of its presence" এবং এই ইতিহাস- চৈতন্য কাব্যকে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে সমৃদ্ধ ও প্রাণবান করে — "This historical sense which is a sense of the timeless as well as the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional."[৪]

জীবনানন্দ নিজে এ প্রসঙ্গে বলেছেন – "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা এবং মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান – তিনি তাই আজকের এই উনিশশো ছেচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসের বা উনিশশো পঁয়তাল্লিশের অক্টোবরের রাজনীতি ও অর্থনীতির হারজিতের পাঁয়তারার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে কবি নন, তিনি এই রকম বহির্মুখী চৈতন্যরাশি উপলব্ধি করেও তবুও তিনি তাঁর কবিতাকে সাময়িকতার সংস্কারমুক্ত করে যে সময় ব্রহ্মের শুদ্ধ স্বরূপের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেছেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন করার ভার আমাদের উপর ততটা নয়.."[৫]

Discussion:

বোঝা যায় 'বনলতা সেন' কাব্যে জীবনানন্দ তাঁর ইতিহাস-চেতনায় 'বড়ো বড়ো ঘটনার তারিখ ও বিবরণ' রাখেননি এবং প্রচলিত অর্থের ইতিহাস-চেতনাকেও আদৌ গ্রহণ করেননি। এই কাব্যগ্রন্থে নারীকে বা নারীকেন্দ্রিক প্রেমকে মাধ্যম করে প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দের প্রবল ইতিহাস-চেতনা। এবার আমরা এই কাব্যগ্রন্থের 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে সামনে রেখে অবশ্যই দেখে নিতে পারি জীবনানন্দের নারী তথা নারীপ্রেমকেন্দ্রিক ইতিহাস-চেতনার গভীরতাকে।

“হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
....
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য .....
....
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন ?” (বনলতা সেন)

এই কবিতায় দুটি চরিত্র। একটি পুরুষ এবং অপরটি নারী। পুরুষ চরিত্রটি নামহীন তথা নির্বিশেষ। জীবনানন্দ তাকে প্রবহমান সময়-চেতনা দিয়ে তৈরি করেছেন। নারী- চরিত্রটির নাম “বনলতা সেন’, জীবনানন্দ যাকে ইতিহাস-চেতনা দিয়ে তৈরি করেছেন। এইভাবে ‘বনলতা সেন’ কাব্যে সময়-চেতনা ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পরিপূর্ণতা পেয়েছে।কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেনের রূপের বর্ণনায় ‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য’। এই বর্ণনাতে এডগার অ্যালান পোর ‘To Helen’ কবিতার বর্ণসাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, পো-র ‘To Helen’ কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে নারীর ‘Thy hyacinth hair, thy, classic face এর সঙ্গে ‘The glory that was Greece’ ও ‘The grandeur that was Rome যোগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তার তুলনায় বনলতা সেনের যেরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা জীবনানন্দ করেছেন তা অনেক বেশি প্রভাবশালী। তার কারণ কবিতাটিতে বনলতার মুখ শ্রাবস্তীর শিল্পে সজ্জিত অর্থে শুধু রূপ সৌন্দর্যের উৎকর্ষই ফুটে উঠেছে তা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী শ্রাবস্তী বৌদ্ধ শিল্পীর কাজে যে বৌদ্ধিক প্রশান্তি আছে, মৈত্রী, প্রীতিঘন করুণা আছে, তাও ব্যঞ্জিত হয়েছে। বনলতার চুল বিদিশার নিশা’ কাল মাত্র, প্রাচীন ভারতের তথা কালিদাসীয় ঐতিহ্য ও রোমান্টিকতা ব্যাপ্ত হয়েছে। চুলের রং কতটা কালো তাও ওই বিদিশার রাত্রির অন্ধকারের সুদূরতায় আভাসিত। এছাড়া, হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি’ এই পঙক্তিটি পড়তে গিয়ে আমরা কবি কীটসের “Much have I travell’d in the realms of gold/And many goodly states and kingdoms seen” (on First Looking In to Champman’s Homer) কবিতাংশ ভাবতে পারি। এই কবিতার পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের ভাব কল্পনা উকি মারতে থাকে, ‘দূর হতে আমি দেখেছি তোমারে ওই বাতায়ন তলে। নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে/আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে’। বনলতা সেন কবিতার শেষে আছে, ‘থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন’। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ কাব্যের বিখ্যাত ‘স্বপ্ন’ কবিতার উপসংহার মিলিয়ে নেওয়া যায়, ‘রজনীর অন্ধকার/উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।’

রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদ ও কালিদাসের যুগকে নতুন করে তুলে ধরেছিলেন জীবনানন্দও তেমনই প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন বিশ্বকে ‘বনলতা সেন’ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট করেছেন। তাই জীবনানন্দ হাঁটেন হাজার বছর ধরে, তাঁর

ভ্রমণের পথে পড়ে সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরের নিশীথ অন্ধকার, পড়ে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, পড়ে বিদর্ভ শ্রাবস্তী, বিদিশার কারুকার্যময় যুগ। হাজার বছর আগে মারা গেছে যে সব রূপসীরা এশিয়ায়, মিশরে, বিদিশায়, তাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে যায় কোনো এক গভীর হাওয়ার রাতে। বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের উপর উজ্জ্বল চামড়া, পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গে নিটোল মুক্তা প্রবাল, অপরূপ সব খিলান, গম্বুজের বেদনাময় রেখা, সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি। আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোক দেখতে দেখতে তাঁর পথ-প্রদক্ষিণ। মধ্যযুগের অবসান স্থির করে দিতে গিয়ে ইউরোপ, গ্রীস যখন উজ্জ্বল খ্রিষ্টান হতে চলেছে, তিনি হাজির ছিলেন সেখানে। এক তারা ভরা রাতের বাতাসে ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল উতরোল বড় সাগরের পথে। বুদ্ধ, কনফুশিয়াসের প্রাণাধিক পরিচয় ছিল তাঁর। ‘বনলতা সেন’ কাব্য থেকে এখানে কয়েকটা উদাহরণ — যা থেকে সুস্পষ্ট হবে জীবনানন্দ ইতিহাসের তথ্যের জটিলতা কাটিয়ে একেবারে ইতিহাসের মর্মে গিয়ে বসেছেন –

“সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি।
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।” (সবিতা)

“যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে;” (সুরঞ্জনা)

জীবনানন্দ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে চীন, মিশর, গ্রীস, বেবিলন, এসিরিয়া সর্বত্র ঘুরেছেন।আবার প্রাচীন ইতিহাস তাঁর কাছে রূপকথার ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

“ভারতসমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন;
কোন এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :

পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,

আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,

আর তুমি নারী-

এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।" (নগ্ন নির্জন হাত)

পৃথিবীতে একদিন যা ছিল, আজ আর নেই, তার জন্য কবি বেদনা অনুভব করেছেন। সেই ইতিহাসের সেই প্রেমসৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন তিনি-

"ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,

অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,

লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,

অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি

রামধনু রঙের কাচের জানালা,

ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়

কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের

ক্ষণিক আভাস -

আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।" (নগ্ন নির্জন হাত)

কমলা রঙের রোদ, রামধনু রঙের কাচের জানালা, রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ, অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ঝুসর পাণ্ডুলিপি, ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দা, দূরতর কক্ষ ও কক্ষান্তরের ক্ষণিক আভাস - আমাদের অতীত যুগের বর্ণোজ্জ্বল পূর্ণজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলোচ্য কবিতায়, বর্তমানের পর্দা আবার অতীতকে ঢেকে ফেলবে, তবু ক্ষণিকের রহস্যময় অভিজ্ঞতা তাঁর মনে যে আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, তা চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রেরণা হয়ে জেগে থাকবে।

'বনলতা সেন' কাব্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোকের যুগকে জীবনানন্দ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ সে যুগ হল প্রেমের উদ্দীপনার যুগ যার পিছনে। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার ব্যক্তিগত প্রেমের শক্তি কবি দেখতে পেয়েছেন-

"মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে

ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে

উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে

সেই ইচ্ছা সম্ভব নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়, আরো আলো,

মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।" (সুরঞ্জনা)

 ll All rights reserved. © 2024

"তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।

মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে

ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো

আমাদের নিয়ে যায় ডেকে

শান্তির সঙ্ঘের দিকে – ধর্ম – নির্বাণে;

তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।" (মিতভাষণ)

আর এই সব বিস্তারিত অভিজ্ঞতার পর আমরা যখন পড়ি –

"গ্রীক হিন্দু ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন

শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা নগরীর গায়ে

কী চেয়েছে? কী পেয়েছে? - গিয়েছে হারায়ে।" (সুরঞ্জনা)

অথবা যখন কবি বলেন -

"মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;

বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা;

ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের

উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা" (মিতভাষণ)

এমনি ভাবে প্রতি যুগেই মানুষ পৃথিবীর কাছে শান্তি চেয়েছে, আশ্রয় চেয়েছে কিন্তু জীবনকে কোনো 'শান্ত দৃঢ়তা' দিতে শেখেনি। ফলে মহাপুরুষরা বা মনীষীরা যে বাণীউচ্চারণ করেছেন, আমরা শুনেছি, কিন্তু পালন করিনি। তাই আমাদের জ্ঞান, নারী, অভিজ্ঞতা ক্রমশ পণ্য হয়ে গেছে এই পণ্য সভ্যতায়। 'আমাদের পিতা বুদ্ধ, কনফুশিয়সের মতো আমাদেরো প্রাণ মুক করে রাখে।' রণক্লান্ত কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে দিতে অতীত থেকে বর্তমানে পৌঁছে আমরা মানুষেরা কখন যে যৌনমত্ততায় 'শূকর' এবং "রুণমত্ততায়' সৈনিক হয়ে গেছি তা নিজেরাও টের পাইনি। 'টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা; এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক - হিম - নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।' 'শিকার' কবিতার হরিণ তো কেবল হরিণই নয়, সে হরিণ মানুষেরই প্রতীক। প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকারের যুগে যে মানুষ আলোর সন্ধানী হয়ে সতর্ক, আধুনিক যুগে সে হয়ে যায় শিকার। এবং সেই হরিণের প্রেমের মতই দায়বদ্ধ মানুষ-

"আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ

পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো

ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,

দেখেছি আমারি হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন;...”　　　　　　　　(সুচেতনা)

এ প্রসঙ্গে কবি নিজে বলেছেন – “এই যুগই অস্পষ্ট, এই ইতিহাসই অন্তঃসার হারিয়ে ফেলেছে. . যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনেরও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অস্তিমবর্ণে নিজেকে – মানবকে ফলিয়ে তুলে – তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায় .... মহাসময়ের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে শতচ্ছিন্ন অন্তরেন্দ্রিয়কে আবার ছেদ করে এ এক মনোমৈত্রী।৬ তাই কবি প্রত্যক্ষ করেছেন-

“অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল;

মানুষকে স্থির – স্থিরতর হতে দেবে না সময়;

সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।

অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়

দূর সাগরের শব্দ – শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে;

কাল কিছু হয়েছিল — হবে কি শাশ্বতকাল পরে।”　　　　　　　　(শ্যামলী)

এই পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা সত্য হতে পারে; কিন্তু এটাই শেষ সত্য নয়। হৃদয় বলেও কিছু আছে। সেখানেই মানুষের ক্রমমুক্তি। সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। তবু এই ভালোবাসার জয়ের দ্বারাই পৃথিবীর সব কিছু হওয়া সম্ভব। প্রাণের একান্ত কথাটি কবির উচ্চারণে নিবিড় হয়ে উঠেছে। এ জন্ম না হলেই হয়তো ভালো হত অনুভব করে শেষে এসে যে লাভ হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

“দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—

শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।”　　　　　　　　(সুচেতনা)

এখানেই ভালোবাসার পূর্ণতা, প্রেমের আশাবাদ। প্রতি সভ্যতা তার সংকল্প, উদ্যম একদা কালের ধর্মে হারিয়ে ফেলে কিন্তু নারী বাঁচিয়ে রাখে ব্যক্তি মানবকে এবং সমষ্টি মানবকে। তাই জীবনের সব লেন দেন ছেড়ে দিলেও ‘বনলতা’কে আমরা ভুলতে পারি না। সে-ই শাশ্বত, সে-ই প্রাণ। জীবনানন্দের ইতিহাস-চেতনায় এই নারীর কাছেই শেষ আশ্রয়-

“অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে

দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি

সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু

দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি।”　　　　　　　　(মিতভাষণ)

তাই ধর্ম, সঙ্ঘ, শক্তির চেয়েও মানুষ চায় ‘আরো আলো; মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়’। – এমন আশাই তাকে ইতিহাসের দীর্ঘ যাত্রার উত্তরণ তটে এনে দিয়েছে।

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

Conclusion:

'বনলতা সেন' কাব্যে বিভিন্ন নগর-নগরী – বিদিশা, শ্রাবস্তী, বিদর্ভ, সিংহল, এশিরিয়, মিশর, পারস্য, কাশ্মির, দ্বারকা, তিলোত্তমা নগরী, ইউরোপ, গ্রীস, বেবিলন এবং বিভিন্ন মানুষ-মানুষী, যেমন, বিম্বিসার, অশোক, শিব, বুদ্ধ, মহেন্দ্র, কনফুশিয়স, পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যা, রাধিকা। এইভাবে বিভিন্ন নগর-নগরীর প্রাচীনতা এবং মানুষ-মানুষীর আবহমান উজ্জ্বলতা -এ ইতিহাসের বিশেষ স্বাদ তথা বৈচিত্র্য বহন করে এনেছে। জীবনানন্দের তাই ইতিহাস-চেতনায় আছে যুগ যুগ বাহিত জীবনসাধনা, যে জীবনসাধনায় 'ভালো মানব সমাজ আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে গড়ে দেব, আজ নয় ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে' – অর্থাৎ ত্রাস ও লোভ লালসা উত্তীর্ণ হয়ে সুখী মানবসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্নে নিবিড় হয়ে আছে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যের ইতিহাস-চেতনায়।এই 'বোধ' নিয়েই জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা। সমস্ত মৃত নক্ষত্রকে, অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো' প্রাণিত ও প্রাণহীনতার পরপারে জীবজগতের বিন্দুতে ধারণ করেন তিনি। আকাশ তাঁকে শতাব্দীর পর শতাব্দী, কোটি কোটি বছর জুড়ে নতুন নক্ষত্র জন্মের ও মৃত নক্ষত্রের ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়। স্মৃতি প্রত্যাবর্তনের নীল অত্যাচার, অতীত ও বর্তমানকে আকাশ ও মাটির বিযুক্তির সঙ্গে একীভূত করে রেখেছে। জীবনানন্দ সেই কঠিন অস্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্কটদীর্ণ পৃথিবী ও স্বদেশকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১) জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা অংশ

২) জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, পৃষ্ঠা- ৪০

৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধ : ইতিহাস ও সংস্কৃতি

৪) Eliot, Tradition and the Individual Talent, Point of View, Page-25

৫) জীবনানন্দ দাশ, উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য : কবিতার কথা, পৃষ্ঠা-৪০

৬) জীবনানন্দ দাশ, মাত্রা চেতনা : কবিতার কথা, পৃষ্ঠা-৪১

গ্রন্থপঞ্জি

দাশ জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ, সম্পা.- দেবীপ্রসাদবন্দ্যোপাধ্যায়, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩

মিত্র, মঞ্জুভাষ, কবিতার কারুকার্য ও জীবনানন্দ দাশ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮

দাশ জীবনানন্দ, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৯৩

মজুমদার বিনয়, ধূসর জীবনানন্দ, কবিতীর্থ, কলকাতা, ১৪১০

ভট্টাচার্য সঞ্জয়, কবি জীবনানন্দ দাশ, ভারবি, কলকাতা, ২০০৩

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

চক্রবর্তী সুমিতা, জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০১

দাশগুপ্ত অলোকরঞ্জন, জীবনানন্দ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

দাশ প্রভাতকুমার, জীবনানন্দ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

ভট্টাচার্য তপোধীর, জীবনানন্দ কবিতার সংকেত বিশ্ব, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০১

ত্রিপাঠী দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯২

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯

ভট্টাচার্য বীতশোক, জীবনানন্দ, বাণী শিক্ষা, কলকাতা, ২০০১

মজুমদার সেন জহর, জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য, মডেল পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩

মিত্র, মঞ্জুভাষ, কবিতার কারুকার্য ও জীবনানন্দ দাশ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৮

মিত্র প্রদ্যুম্ন, কবিতার গাঢ় এনামেল : জীবনানন্দের কাব্যভাবনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০

রায় কৃষ্ণগোপাল, জীবনানন্দের কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯৯

দাশ জীবনানন্দ, সমালোচনা সমগ্র, সম্পা.- সৈয়দ আব্দুল মান্নান, রূপমপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩

দাশ জীবনানন্দ, প্রবন্ধ সমগ্র, সম্পা.- ভূমেন্দ্র গুহ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯.

Citation: সাহা, মৌ. (২০২৪) "জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যে ইতিহাস চেতনা" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-4 May-2024.